গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৭ মার্চ ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা
কমরেড স্ট্যালিন স্মরণে

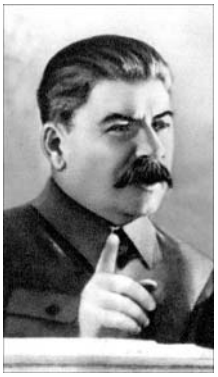

বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এমন বহু অপরাধের অভিযোগ আনা হবে, যে অপরাধ তারা করেনি। কিন্তু ইতিহাসের ঝোড়ো বাতাস অবশ্যই আমাদের কবরের ওপর থেকে কুৎসার শুকনো ঝরা পাতাগুলি উড়িয়ে দেবে, সত্যকে উদঘাটিত করবে। — স্ট্যালিন

৫ মার্চ, ২০০৩ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালনে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে রাজ্যে রাজ্যে জনসভা ও অন্যান্য কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ঐদিন কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে বিশাল সমাবেশে কমরেড স্ট্যালিনের জীবন, কর্মকান্ড ও আজকের দিনে তার তাৎপর্যের উপর বক্তব্য রাখেন সভার প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড সনৎ দত্ত। এ সম্পর্কে বিশদ সংবাদ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

স্ট্যালিনের উদ্ধৃতিটি রাশিয়ার সিয়েরপ-ই-মোলাত (কাস্তে ও হাতুড়িং পত্রিকায় প্রকাশিত।

দেশি-বিদেশি একচেটে পুঁজিপতিদের স্বার্থেই এই বাজেট — নীহার মুখার্জী

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতি আরও বেশি করে অনুসরণ করার পথ বেয়ে ২০০৩-০৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট — বেসরকারীকরণ, উৎপাদন শুল্ক ও আমদানি-রপ্তানি শুল্কে ঢালাও ছাড় দেওয়া, বিদেশী অংশীদারিত্ব বাড়ানো, করছাড় ও পরিকাঠামোগত সুযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে শোষক দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নানাভাবে সুবিধা দেওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অপরদিকে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি, যেমন, প্রচন্ড বেকারি, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও ইউনিট ট্রাস্ট প্রভৃতি সাধারণ মানুষের তহবিল নিয়ে সীমাহীন দুর্নীতি সম্পর্কে বাজেট নীরব থেকেছে। উপরন্তু পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ সমস্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে শতকরা ১ ভাগ সুদ কমানো হয়েছে এবং ডিজেল, কাগজ ও ভোজ্য তেল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্যের উপর বাড়তি কর চাপানো হয়েছে যা সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশাকে আরও বাড়াবে। সাথে সাথে অর্থনীতির আরও বেশি সামরিকীকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বিরাটভাবে বাড়ানো হয়েছে। অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচ ও জল সরবরাহের মতো জনপরিষেবামূলক ক্ষেত্রগুলিকে মুনাফাবাজ ব্যক্তিপুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর 'দারিদ্র্য দূরীকরণে'র প্রতিশ্রুতি পূরণের উপায় হিসাবে এধরনের নগ্ন জনবিরোধী ও পুঁজিপতি তোষণের ফরমূলা পেশ করে চূড়ান্ত ভন্ডামিকেই প্রকাশ করেছেন। এই বাজেট স্বভাবতই জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে দেশী-বিদেশী একচেটে পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করবে। এ ধরনের ফ্যাসিবাদি অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।"

বাজেট জনগণকে কী দিল

বেশ কয়েক বছর আগেও বাজেট নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ উদ্বেগ দেখা যেত। কোন্ কোন্ জিনিসের দাম বাড়বে, গরিব ও মধ্যবিত্তের পকেট কতটা কাটা হবে, কয়লা কেরোসিন বনস্পতির দাম বাড়বে কিনা — এসব নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা বাজেটের আগে হত। কারণ বাজেটে মোটামুটি আগামী এক বছরের জন্য সরকারি কর ও দরের ঘোষণা করা হত। এখন আর তা নেই। বছরের যে কোন সময় বাজেট বহির্ভূত ঘোষণায় দাম বাড়ানো, সেস বা সারচার্জ বসানো রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজেটে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে কিনা — এটা এখন বড় খবর নয়। আগে বাজারদরের উপর যতটুকু সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল, তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের নামে সেটাও বহুলাংশে তুলে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের পকেটে একটা স্থায়ী ফুটো করেই দেওয়া হয়েছে।

ইদানীং বাজেটে মূল দেখার বিষয়টা দাঁড়িয়েছে সরকার কত কর ছাড় দিচ্ছে এবং কোন্ কোন্ একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী তাতে লাভবান হচ্ছে। এখন বাজেটের সপ্তাহখানেক আগে থেকেই খবরের কাগজ রেডিও টি-ভিতে প্রাক্-বাজেট আলোচনায় বসছেন উচ্চস্তরের আমলা, অর্থনীতিবিদ, একচেটিয়া মালিকদের সংস্থার প্রতিনিধি, কর্পোরেট কর্তারা। তাঁরাই কার্যত সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছেন, "দেশের উন্নয়নের স্বার্থে" তাঁরা সরকারের কাছে কী কী চান! এছাড়া আছে আমলা, মালিক, কর্পোরেট-কর্তা, এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতিদের নিয়ে তৈরি একাধিক পরামর্শদাতা কমিটি, নানা বিষয়ে যারা সময় সময় সরকারকে প্রস্তাব দিচ্ছে। সরকার সেই প্রস্তাবগুলি যতদূর সম্ভব পূরণ করছে। সব মিলিয়ে বাজেট হচ্ছে একই আর্থিক নীতির স্রোত ধরে গা ভাসানো, তা সরকারে কংগ্রেস, বিজেপি বা সরকারি বামপন্থীদের তৃতীয় বিকল্প, যেই থাক।

এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থমন্ত্রী এবার তাঁর বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই, ইতিহাসবিদ টয়েনবির নাম না করে তাঁর বহুচর্চিত তত্ত্ব থেকে শব্দ ধার করে "দি চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড দি রেসপন্স" শিরোনাম বসিয়েছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ ভাষণে চ্যালেঞ্জ কিসের, কিসেরই বা রেসপন্স বোঝা যায়নি। "নাগরিকদের স্বার্থরক্ষাই" আর্থিক নীতির মূল — এই কথা দিয়ে ভাষণ শুরু করলেও ৮০ কোটি ভারতবাসীর মূল সমস্যা যে খাদ্য চাকরি শিক্ষা স্বাস্থ্য — তার কোন চ্যালেঞ্জ তিনি নেননি, রেসপন্সও করেননি। এবারের বাজেটের প্রধান

দুয়ের পাতায় দেখুন

ইরাকের বীর জনগণকে অভিনন্দন
বাগদাদ সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জী

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মূল কয়েকটি কারণে ইরাক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। একদিকে রয়েছে তেলের স্বার্থ। তেলের উপর দখলদারির মধ্য দিয়ে সে বিশ্ব-পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ওপর তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছে। অন্যদিকে প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত মার্কিন শাসকেরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অস্ত্রনির্মাণ শিল্পকে চাঙ্গা করে কৃত্রিমভাবে অর্থনীতির মন্দা কাটাতে এবং ধর্মবর্ণগত বিভেদের জিগির তুলে মার্কিন জনগণের দৃষ্টিকে প্রকৃত সমস্যা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে"। ২০ ফেব্রুয়ারি ইরাকে নন-অ্যালায়েনড স্টুডেন্টস অ্যাণ্ড ইয়ুথ অরগানাইজেশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে এই কথা বলেছেন অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের অন্যতম সহসভাপতি, এস ইউ সি আই নেতা কমরেড মানিক মুখার্জী।

১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরে "নো ওয়ার অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেশন অন ইরাক" বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ৩৬টি দেশ থেকে ৩৫২ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে গৃহীত মূল প্রস্তাব ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যে পরিবেশ দূষণ ঘটছে তার বিরুদ্ধেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড মানিক মুখার্জীর লিখিত ভাষণ ফটোকপি করে প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি বাগদাদ সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

১৯ ফেব্রুয়ারি বাগদাদে ৫০০০ আসনবিশিষ্ট পিপলস প্যালেসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। ২০ ও ২১ প্যালেস্টিন হোটেল হলে সেমিনার হয়। ২০শে সংক্ষিপ্ত ভাষণে

চারের পাতায় দেখুন

রেলযাত্রীদের অভাব অভিযোগের কোন প্রতিফলন নেই

রেলমন্ত্রী নীতিশকুমার ২০০৩-'০৪ সালের রেল বাজেট পেশ করেছেন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি। রাজস্ব খাতে এবার যথেষ্ট উপার্জন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে রেলমন্ত্রী যাত্রীভাড়া অপরিবর্তিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। গত বছরের বাজেটে যাত্রীভাড়া এবং পণ্য মাশুল বাড়িয়ে জনসাধারণের কাঁধে ২২২০ কোটি টাকার বোঝা চাপানোর পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের বাজেটে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই খানিকটা স্বস্তিবোধ করলেও এর পিছনে যে আশু কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ফয়দা তোলার ছক রয়েছে — তা সকলের কাছে স্পষ্ট। গত রেল বাজেট পেশের আগে, '০১ সালের আগস্ট মাসে যাত্রী-নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে ৮৬০ কোটি টাকার সারচার্জ বসিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর গত বছরের রেলবাজেটে নতুন করে আবার ঐ যাত্রী নিরাপত্তার খাতেই টিকিট পিছু ১ টাকা করে সারচার্জ বসানো হয়। সাধারণ মানুষের প্রতি সত্যিকারের দরদ থাকলে তাঁরা এবারের বাজেটে ঐ সারচার্জের বোঝা তুলে নিতে পারতেন অথবা যাত্রীভাড়া কিছুটা কমিয়ে দিতে পারতেন। তা তিনি করেননি।

জনসাধারণের প্রতি না হলেও বৃহৎ শিল্পপতি, আমলা ও মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিদের প্রতি রেলমন্ত্রী যথেষ্টই উদারতা দেখিয়েছেন। সাধারণ ট্রেনে যাত্রীভাড়া কমিয়ে সাধারণ ও নিত্যযাত্রীদের বোঝা হালকা করার বদলে তিনি রাজধানী, শতাব্দী কিংবা জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের মতো উচ্চভাড়ার ট্রেনের ভাড়া কমিয়েছেন। এই এক্সপ্রেসগুলিতে মূলত ব্যবসায়ী, বড় আমলা বা বিত্তশালীরা যাতায়াত করে থাকেন। এরই সঙ্গে তিনি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতির ওপর নির্ধারিত মাশুলের হার কমিয়ে দিয়েছেন। গত ১০ বছরের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, পণ্য মাশুল ও যাত্রীভাড়া মিলে রেলের যা আয়, তার মধ্যে যাত্রীভাড়া থেকে আয়ের অনুপাত বাড়ছে। গত বছর শতকরা হিসাবে যাত্রীভাড়ার পরিমাণ ছিল মোট পণ্য মাশুলের ৪৭.৭৫ শতাংশ; এবছরের বাজেটে সেটা ৪৮.৯৭ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। (তথ্য ঃ ইকনমিক টাইমস, ২৭-২-০৩)।

আমরা সকলেই জানি, রেলে পণ্য পরিবহনের মাশুল বাড়ানো হলে, বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, সাধারণ মানুষের ওপর চাপও বাড়ে। এই নিয়মে মনে হতেই পারে, মাশুল কমানো হলে, বাজারে পণ্যের দাম কমবে, স্বস্তি মিলবে সাধারণ মানুষের। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। মাশুল কমে যাওয়ার লাভটা নেয় মালিকরা। এবারও মাশুল কমার ফলে বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাই বেশি পরিমাণ মুনাফা লুটবার সুযোগ পাবে। স্বভাবতই, বৃহৎ শিল্পমালিকদের সংগঠন চেম্বার অফ কমার্স-গুলির সবকটি-ই দু-হাত তুলে এজন্য রেলমন্ত্রীকে আশীর্বাদ করেছে।

এখন, নির্বাচনের আগে যাত্রীভাড়া বাড়ানো হয়নি বলে পরবর্তী বাজেট পর্যন্ত তা এই

পর্যায়েই স্থির থাকবে — নিশ্চিত করে এ কথা বলা যায় না। বরং অতীত অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথাই বলে। তাই ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর অন্তর্বর্তী অর্ডিন্যান্স এনে যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল দুই-ই বৃদ্ধি করবার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

ইদানীং রেল দুর্ঘটনা ভয়ঙ্করভাবে বেড়েছে। তদন্ত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর জন্য দায়ী দীর্ঘদিন মেরামত না হওয়া রেললাইন অথবা রেলব্রিজ। এবারে বাজেটেও যাত্রী নিরাপত্তার এই দিকটি অবহেলিত হয়েছে। রেলমন্ত্রী দুর্ঘটনার হার কমাতে ট্রেনের যন্ত্র-প্রযুক্তিগত দিক, সিগন্যাল ব্যবস্থা, রেলওয়ে ট্র্যাক ও ব্রিজ মেরামত ও উন্নততর করার কোনও ব্যবস্থার কথা এই বাজেটে ঘোষণা না করে এ সমস্ত দুর্ঘটনার দায় চাপিয়েছেন রেলকর্মীদের কাঁধে। অথচ রেলদপ্তরে অধিক সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতেও তিনি গররাজি। দুর্ঘটনা থেকে ট্রেনগুলিকে রক্ষা করতে যে উন্নত 'অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস' বা 'সংঘর্ষ নিরোধী যন্ত্র' নিয়ে একসময় যথেষ্ট হৈ চৈ হয়েছে, এ বছরের ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫০ হাজার কিমি দীর্ঘ ভারতীয় রেলপথের মধ্যে মাত্র ১৮০০ কিমি লাইনে তা বসানো হয়েছে; আরো ১৬৪১ কিমি রেলপথ এখনও সার্ভের আওতায়। প্রশ্ন ওঠে, অবশিষ্ট প্রায় ৪৭ হাজার কিমি দীর্ঘ রেলপথ আর কতদিন অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে?

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য ও রেল-আমলাদের বিলাসিতা এবং রেলদপ্তরের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিষয়ে যেরকম ধূর্ততার সঙ্গে নীতিশকুমার মুখে কুলুপ এঁটেছেন — তা নিয়েও বহু মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন।

রেলজোন বিভাজন ও সেই সংক্রান্ত অন্য বিষয়গুলি নিয়ে যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে ফয়দা তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি না হতে পারে, সেজন্য রেলমন্ত্রী উন্নয়ন খাতে নামমাত্র অর্থ বরাদ্দ করে বিবেচনাবিহীনভাবে ৫০টি নতুন ট্রেনের ঘোষণা করার সাথে সাথে বেশ কয়েকটি পুরনো ট্রেনের যাত্রাপথ বৃদ্ধি করেছেন। এ কাজটি ভোটের দিকে তাকিয়ে সহজ জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য পূর্বাপর সব রেলমন্ত্রীই করে আসছেন। বহুবার দাবি করা সত্ত্বেও রেললাইনের সংস্কার করা হচ্ছেনা, সম্প্রসারণ হচ্ছেনা, এক লাইনে চলাচলের জায়গাগুলিতে ডবল লাইন করার ব্যবস্থা হচ্ছেনা, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন চরম খারাপের দিকে যাচ্ছে, অথচ তার কোন ব্যবস্থা না করে গাড়ির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ানো হচ্ছে। নীটফল প্রায় প্রতিদিন রেল দুর্ঘটনা, রেলে যাত্রীর মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক লেটের ফলে যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চরম দুর্ভোগ। নীতিশকুমারও লোক-ঠকানোর সেই পথেই হেঁটেছেন।

এক কথায় বলতে গেলে, সাম্প্রতিক রেল বাজেটটি হল রাজ্যে রাজ্যে আগামী নির্বাচনের লক্ষ্যে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের একটি ধূর্ত চাল। যেখানে যাত্রীকল্যাণের বড় বড় কথার আড়ালে রেলযাত্রা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সকল ন্যায্য অভাব-অভিযোগকেই চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ মালিকশ্রেণী খুশি

একের পাতার পর

লক্ষণীয় বিষয়টা হল ঢালাও বেসরকারীকরণের ঝোঁক। 'স্বদেশী'র মন্ত্রভজা বিজেপি বিদেশী পুঁজির স্বার্থ দেখতে তৎপরতা দেখিয়েছে খুব। রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি দু'রকম ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেই বিদেশী পুঁজির সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি তাদের বেশি ক্ষমতা দিতে শেয়ার হোল্ডারদের ভোটাধিকারের আইনকানুনও বদলাবে বলেছে। আর স্বদেশী পুঁজির তো কথাই নেই। আদবানীজি স্বদেশী বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন — স্বদেশী বলতে তাঁরা স্বদেশী একচেটিয়া মালিকদের বাড়বাড়ন্ত বোঝান। বাজেটে তা পরিষ্কার। স্বদেশী একচেটিয়া গোষ্ঠীকে তাঁরা এবার ঝুলি ভরে দিয়েছেন। একে 'ভরতুকি' বলা যাবে না, বলতে হবে "উন্নয়নের স্বার্থে", অর্থমন্ত্রীর ভাষায় "গরিবোঁ কে পেট মে দানা" দেওয়ার জন্য পুঁজিপতিদের কর ছাড়। দেশের প্রধান পাঁচ ধরনের বৃহৎ শিল্প — ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি, টেক্সটাইল, পেট্রোকেম ও টেলিকম শিল্পের মালিকগোষ্ঠীকে আমদানি ও অন্তঃশুল্কে নানাভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছে। গবেষণার নামে আয়কর ছাড়ের ব্যবস্থাও আছে।

ইদানীং একটা কথা বারবার আসছে যে ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে রিলায়েন্স ও টাটা গোষ্ঠীর লড়াই সংসদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং এই লড়াইতে জড়িয়েই প্রমোদ মহাজনের মন্ত্রীত্ব খোয়া গিয়েছে। এটা নতুন কোন বৈশিষ্ট্য নয়। পুঁজিবাদী সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এ-ভাবেই বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতি গোষ্ঠী পছন্দমত সরকারকে দিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে। এ সরকারগুলির কোনটাই জনগণের সরকার নয়, মালিকদের সরকার। আগেকার সাথে এখনকার পার্থক্য শুধু এই যে, এখন 'খোলাবাজার' নীতিতে পুঁজিপতিদের দালালিটা সরকারি দলগুলির নেতামন্ত্রীরা খোলাখুলি করছেন। বাজেটে কম বেশি সব একচেটে গোষ্ঠীরই স্বার্থ দেখা হয়েছে। রিলায়েন্স, টাটা, নসলি ওয়াদিয়া, আজিম প্রেমজি — কেউ বাদ যায়নি।

তবে দেশের আর্থিক বিকাশে সরকারের ভূমিকা নিয়ে বাজেটে বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য নেই। সরকারি বিনিয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই। বরং পরিকাঠামো থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত সর্বত্র বেসরকারি পুঁজিকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে বিনিয়োগ হবে, কে করবে, আদৌ করবে কিনা — তার কোন হদিশ নেই। একদিকে সরকার বলছে এবছর মোট জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ৪.৪ শতাংশ, আগামী বছরগুলিতে ১০ শতাংশ বৃদ্ধির আশা করা হয়েছে। কিন্তু কী করে সেখানে পৌঁছান যাবে, সে প্রশ্নে সরকারি উদ্যোগের অনুপস্থিতিই বলছে বিজেপি সরকার সবটাই ছেড়ে দিয়েছে বেসরকারি পুঁজির হাতে। সরকারের কাজ হয়েছে কর ছাড় দিয়ে এবং নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে মালিকদের মুনাফা সুনিশ্চিত করা। বাজেটে তাই-ই করা হয়েছে। কাজেই বাজেটে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী এবং চেম্বার্স অব কমার্সগুলি খুবই খুশি।

কিন্তু আপামর জনগণকে বাজেট কী দিল? স্বল্প সঞ্চয়ে এবং পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে আরও এক শতাংশ সুদ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বাজেটে। ফলে, ব্যাঙ্কের সুদও কমবে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে জনগণের বহু কষ্টে অর্জিত জমানো টাকায় সুদের হার ১২ শতাংশ থেকে কমে ৬/৭ শতাংশ দাঁড়াল। অন্যদিকে মোটরগাড়ি, বিদেশী মদের দাম কমানোর সাথে সাথে ডিজেল, বনস্পতি, রান্নার তেল, সার ও কাগজের মতো অত্যাবশ্যক পণ্যের ওপর কর বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতার শুরুতে যে পাঁচটি মূল লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন তার মধ্যে বেকার সমস্যা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা বলেছিলেন, কিন্তু দু'ঘণ্টার বাজেট ভাষণ শেষে তার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের হদিস তিনি দেননি।

সর্বশেষে আয়-ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন মোট ৪,৩৮,৭৯৫ কোটি টাকার বাজেটে ১,৫৩,৬৩৭ কোটি টাকাই ঘাটতি। যদি জনস্বার্থে ব্যয় করে কিংবা সরকারি বিনিয়োগ করতে গিয়ে ঘাটতি হত, তাহলে একটা কথা ছিল। এখন হচ্ছে তার উল্টো। এমনিতেই জনস্বার্থে দেয় ভরতুকির বিরুদ্ধে প্রচার যত বেশি, ভরতুকি মোটেই তত বেশি নয়। গত বছর বাজেটে মোট এই ভরতুকি ছিল ৩৯,৮০১ কোটি টাকা। মোট সরকারি খরচের ১০ ভাগের একভাগ মাত্র, যারও বড় অংশ যাচ্ছে পয়সাওয়ালাদের পকেটে। এবার ভরতুকি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী প্রায় চুপচাপ। হয়ত রাজ্যে রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের মুখে জনরোষ বাড়াতে চাননি বলেই প্রসঙ্গটি তিনি চেপে গিয়েছেন। তাতে তাদের অসুবিধার কিছু নেই — দরবৃদ্ধি, ভরতুকি ছাঁটাই বাজেটের পরেও করা যায়। নইলে গণতন্ত্রে অর্ডিন্যান্স করার ক্ষমতাটা সরকারকে দেওয়া হয়েছে কেন!

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর সংসদ অভিযান

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারীকরণ, মালিকস্বার্থে শ্রম আইন পরিবর্তন, আমদানি শুল্ক হ্রাস, কর্মী ও কর্মসংকোচনের প্রতিবাদে এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প গ্রহণ, ক্ষেতমজুরদের জন্য সুসংহত আইন প্রণয়ন, বোনাস আইনের সংশোধন প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে সুদের হার বাড়ানোর দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে আসা লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে সংসদ অভিযানে সামিল হয়। সাম্প্রতিক-কালের বৃহত্তম এই অভিযানকে সরকারের পুলিশবাহিনী সংসদ থেকে বহুদূরে বারখাম্বা রোডের জংশনে আটকে দিলে সেখানেই শ্রমিক-কর্মচারীদের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই টি ইউ সি, সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এ আই সি সি টি ইউ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন সহ দেশের বিভিন্ন কর্মচারী ফেডারেশন। এই অভিযানে যোগ দেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, হরিয়ানা, কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সহ দেশের অধিকাংশ রাজ্য থেকে আসা হাজার হাজার সংগঠিত-অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারী। সমাবেশে এইচ এম এস-এর সভাপতি উমরাওমল পুরোহিত মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বাজেট সেশনের দ্বিতীয়ার্ধে একদিনের সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। সাধারণ ধর্মঘটের তারিখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ১২ মার্চ আলোচনা করে ঘোষণা করবেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে শ্রমিক-কর্মচারীর যৌথ বিক্ষোভ মিছিল

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতোই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও মালিকশ্রেণীর বহুমুখী আক্রমণের সম্মুখীন। শুধু দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণীই নয়, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিশ্রেণী মিলিতভাবে এই আক্রমণ নামিয়ে আনছে। তিনি বলেন, আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু কর্মী ও কর্মসংকোচন এবং শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত অধিকার হরণ। অভিজ্ঞতা বলে, সরকার পাল্টালেই নীতির পরিবর্তন হয় না। তাই সচেতন সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের আঘাতেই শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিনিয়ে আনতে হবে। এই লক্ষ্যেই আগামী একদিনের সাধারণ ধর্মঘট এবং পরবর্তীতে লাগাতার ধর্মঘটের সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য তিনি আহবান জানান।

কলকাতায় সমাবেশ

এই কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে একই দিনে কলকাতার ব্রিগেড গ্রাউণ্ডে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সি আই টি ইউ-র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক চিত্তব্রত মজুমদার। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সনৎ দত্ত, সি আই টি ইউ'র জ্যোতি বসু, ইউ টি ইউ সি'র সুনীল সেনগুপ্ত, টি ইউ সি সি'র বীর সিং মাহাতো, এ আই টি ইউ সি'র আব্দুল মান্নান এবং এ আই সি সি টি ইউ'র বাসুদেব বসু সহ বিভিন্ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত বলেন, দ্বিতীয় শ্রম কমিশন মালিকদের হাতে অবাধ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকার দেওয়ার সুপারিশ করেছে। বর্তমানে রাজ্যে রাজ্যে কল-কারখানা বন্ধ ও শ্রমিক ছাঁটাই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের ঘটনা। শুধু সভা, সমাবেশ বা একদিনের সাধারণ ধর্মঘট করে এই আক্রমণ রোখা যাবে না। এই আক্রমণের মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। যতদিন এই ব্যবস্থা টিকে থাকবে ততদিন শ্রমিকশ্রেণীর ওপর এই শোষণ আক্রমণ চলতেই থাকবে। তাই এই আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে এই ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রটিকে ঠিক ঠিক ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে উন্মোচিত করতে হবে, তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে সঠিক শ্রেণীচেতনা। এই চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া যাবে।

গুজরাট ঃ যেসব প্রশ্নের উত্তর এক বছরেও পাওয়া গেল না

২৭ ফেব্রুয়ারি। এক বছর আগে এই দিনটিতেই গুজরাটের গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের আগুনে ৫৮ জন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল। ঐ আগুনকে অজুহাত করেই এরপর শুরু করা হয়েছিল সুসংগঠিত গণহত্যা। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত তাণ্ডব যে নৃশংসতা নিয়ে গুজরাটে দেখা গিয়েছিল, ইতিপূর্বে কখনও তা দেখা যায়নি। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, গৃহহীন, সহায়সম্বলহীন করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। এই ঘটনা গুজরাট সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের ধারণাকে বদলে দিয়েছে। গুজরাট আজ একটি রাজ্যের নিছক নাম কেবল নয়? গুজরাট বললেই এখন বোঝায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা। সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা ও তার ফলাফলকে যারা ধিক্কার জানিয়েছে, গুজরাট সম্পর্কে কেবল তারাই এই ধারণাটা পোষণ করে, তা নয়। যারা ওই গণহত্যার নায়ক, তাদের দৃষ্টিতেও গুজরাটের অন্য কোনও ছবি নেই। এদের কাছে গুজরাট এতটাই বড় প্রতীকে পরিণত হয়েছে যে, এরা এখন হুমকি দিচ্ছে সমগ্র দেশেই 'গুজরাট পরীক্ষার' পুনরাবৃত্তি করবে।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ধর্মসংসদে এই ঘোষণা করেছেন বজরং দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা আচার্য ধর্মেন্দ্র। এর অর্থ হতে পারে দুটি। হয় আচার্য গোধরার মতোই অন্য কোনও রেলকামরায় আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা ভাঁজছেন যাতে আবার সংখ্যালঘু নিধনের অজুহাত তৈরি করা যায়;না হয় তিনি তাদেরই দেওয়া পূর্বেকার এই যুক্তি এখন পরিত্যাগ করেছেন যে, 'গুজরাট গণহত্যার জন্য গোধরাই কারণ' — যে যুক্তি আমাদের সংবাদপত্র (স্টেটসম্যান) কোনদিন সমর্থন করেনি। বিজেপি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি এতদিন নানা কসরৎ করে যুক্তি দিচ্ছিল যে, 'গোধরা না ঘটলে গুজরাট ঘটত না।' এখন আচার্য ধর্মেন্দ্রর হুমকি — 'সর্বত্র গুজরাটের পুনরাবৃত্তি করা হবে' — বিজেপি নেতাদের ঐ যুক্তির ফানুসকেও ফাটিয়ে দিয়েছে। এই হুমকিই বুঝিয়ে দেয় যে, কী উপায়ে গোধরা কাণ্ড ঘটেছিল, সে বিষয়ে আচার্য ও তার সমগোত্রীয়রা যথেষ্টই ওয়াকিবহাল এবং তাঁরা জানেন কীভাবে পুনরায় তা ঘটাতে হয়।

গোধরার রেলকামরায় আগুন সম্পর্কে গুজরাট সরকার ও সংঘ পরিবার যে তত্ত্ব হাজির করেছিল, তার মধ্যে বহু গরমিল ধরিয়ে দিয়েছিল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্ট। কিন্তু সেই রিপোর্টকে সুবিধামতো চেপে দেওয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি গুজরাট সরকার দাবি করেছিল, ট্রেনের আগুন দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত ১২৩ জন ও 'প্রধান ষড়যন্ত্রকারী'র বিরুদ্ধে সরকার মামলা তৈরি করে ফেলেছে। এই দাবির ঠিক এক সপ্তাহ পরেই ঐ মামলার সরকারি কৌঁসুলি প্রকাশ্যেই তার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মামলার নথিপত্র ফেরৎ দিয়েছেন। এই সাহসিকতার জন্য তাঁকে আমাদের অভিনন্দন। কিন্তু কেন তিনি পদত্যাগ করলেন? সরকারের দাবি, তাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যা দিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 'পোটা' প্রয়োগ করা যায়, অথচ রাজ্যের অতিরিক্ত ডি জি পি বলেছেন, প্রধান অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাসি চালিয়েও পুলিশ কিছুই পায়নি।

অপরদিকে, সংগঠিত হত্যাকাণ্ড চালাবার অভিযোগে যেসব দাঙ্গাবাজদের, দেরিতে হলেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তারা এখন জামিনে মুক্ত। এ ধরনের শত শত অভিযোগের মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে শুনানি শুরু হয়েছে। লুঠেরা বাহিনীর পাণ্ডা হিসাবে যেসব বিজেপি ও সংঘ পরিবারের হোমরাচোমরাদের নাম প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে দিয়েছিলেন, তাদের একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। এদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই এটাই পুলিশের বক্তব্য। প্রমাণের এই অভাবের কারণ পুলিশের মানসিকতার মধ্যেই রয়েছে। এই পুলিশই প্রথম এফ আই আর নিতে অস্বীকার করেছিল। পরে যখন অন্তত কয়েকটি নাম গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল, জোর করে সেই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল নেতাদের নাম। এটা কি ন্যায়বিচার? গুলবার্গ সোসাইটি, যেখানে কংগ্রেসের পূর্বতন সাংসদ এহসান জাফরি সহ ৬৮ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানকার সমস্ত বাড়ি আজও শূন্য পড়ে আছে। একজন গৃহস্থেরও সাহস হয়নি নিজের বাসস্থানে ফিরে আসার। গত বছরের তাণ্ডবে বিধবস্ত সকল স্থানেই একই ছবি। সংখ্যালঘুরা ভয়ে কুঁকড়ে আছেন, তাঁরা জানেননা এরপর কারা অথবা কী তাদের উপর আঘাত হানবে। এদের কেউ নিজেদের ঘরবাড়ি, কেউ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করেছেন, এমনকি রাজ্য ছেড়েও কেউ কেউ চলে গিয়েছেন। কিন্তু নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গুজরাটে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে এসেছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সংজ্ঞার সবটাই একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্ভাবন। (সম্পাদকীয়, দি স্টেটসম্যান, ২৮.২.০৩)

ভরতুকি ঃ প্রচার ও বাস্তব

রেডিও টিভিতে বাজেট বিশ্লেষণ শুরু হতেই একাধিক বিশেষজ্ঞ বাজেট ঘাটতির জন্য ভরতুকিকে দায়ী করতে শুরু করেছেন। এই ভরতুকি বলতে তাঁরা জনস্বার্থে দেয় ভরতুকিকেই বুঝিয়ে থাকেন। সরকারি আমলা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, মন্ত্রী মায় খবরের কাগজের কলমচিরা পর্যন্ত দু বেলা বলছেন, ভরতুকি দিতে দিতেই সরকার ফতুর হয়ে গেল। তাঁরা বলছেন না ঋণের সুদ দিতে গিয়ে সরকার ফতুর হয়ে গেল, বলছেন না সামরিক বাজেটের কথা। এমনকি সরকারের মোট ভরতুকি কত, অন্যান্য খরচের তুলনায় তার পরিমাণ কতটা তাও তাঁরা বলছেন না। কেন বলছেন না, হিসাব নিলেই তা বোঝা যাবে —

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়	১০০ পয়সা হলে	মোট ব্যয় কোটি টাকায়
ঋণের সুদ বাবদ	২৪ পঃ	১,২৩,২২৩
সামরিক ব্যয়	১৩ পঃ	৭৬,৯৩২
মোট ভরতুকি	১০ পঃ	৪৯,৯০৭

সম্প্রতি বছর দশেক সরকার নিজে ঘাটতি এবং ভরতুকি বিরোধী প্রচারটা শুরু করেছে, বিশেষজ্ঞ ও কলমচিরা তাতে যোগ দিয়েছেন। আগে ব্যাপারটা উল্টো ছিল। জনসাধারণ বলত ঘাটতির বিরুদ্ধে, কারণ ঘাটতি বাজেট মানেই শেষ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি, যার বোঝা এসে পড়ে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। তখন সরকার ঘাটতির পক্ষে সাফাই গাইত এই বলে যে, সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে, যোজনায় টাকা ঢালতে, পরিকাঠামো গড়তে, ভারি শিল্প, খনি, যানবাহন চালাতে, কৃষিতে ব্যবহৃত সার বিদ্যুতে ভরতুকি দিতে গিয়ে ঘাটতি হচ্ছে। অথচ এটা করা দেশের পক্ষে জরুরি। এই দেশ বলতে তারা কোনদিনই জনসাধারণকে বোঝাত না, বোঝাত শিল্প ও কৃষি-পুঁজিপতিদের এবং এখনও তাই বোঝায়। দেশের স্বার্থের কথার আড়ালে তারা আসলে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখে। তাই তাদের এটা দরকার ছিল। তখন এর বিরুদ্ধে মূলত বলত জনগণ ও বামপন্থীরা।

একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে বিশ্বজোড়া খোলাবাজার প্রচলনের পরেই বিশ্বব্যাঙ্ক আই এম এফের নির্দেশ এল ঘাটতি কমাও, ভরতুকি ছাঁটো। তারা বলল এভাবে খরচ কমিয়ে ঋণের টাকা শোধ দাও। ঋণ দেওয়ার সময় ভরতুকি কমানোর শর্তও তারা জুড়ে দিতে থাকে। এটা ঠিক যে তাদের এই প্রেসক্রিপশনের একটা লক্ষ্য হল ধার দেওয়া টাকা উসুল করা। কিন্তু সেটাই সব নয়। দুনিয়াব্যাপী একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে আসলে তারা চাইছে অর্থনীতির উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে যাক। সরকার যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহনে ভরতুকি দেয় তবে এসব ক্ষেত্রে মালিকরা পুঁজি ঢেলে মুনাফা করতে পারবে না। ফলে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং ভারতীয় একচেটে পুঁজি আওয়াজ তুলল ভরতুকি ছেঁটে ঘাটতি কমাও। সরকারি ঋণ কমাও, সুদ বাবদ খরচ কমাও, এ আওয়াজ তারা তোলেনি, কারণ এতে তাদের মুনাফা বাড়বে না। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহনে ভরতুকি তুলে না দিলে, এগুলির ব্যবসায়ীকরণ না করলে বেসরকারি পুঁজি মুনাফা করতে পারবে না। এই লক্ষ্যেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে ভরতুকি বিরোধী প্রচার। অথচ এই প্রচারের ঝড়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অঙ্কের হিসাবে চোখ দিলে দেখা যাবে **এবছরের মোট ভরতুকি প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা, অথচ মোট ঘাটতি দেড় লক্ষ কোটি টাকারও বেশি।**

যদিও খাদ্য, সার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যে সরকারি ভরতুকির ছিটেফোঁটাই পায় সাধারণ মানুষ; সিংহভাগ ব্যবসায়ীদের পকেটেই যায়। যদি ভরতুকি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া যায়, তবুও বাজেট ঘাটতি লক্ষ কোটি টাকারও বেশি থাকবে। কাজেই ভরতুকি তুলেও ঘাটতি সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হবে না। শুধু যে এর ছিটেফোঁটা মানুষ পেত, তা পাবে না। ভরতুকি যদি কারণ না হয়, তবে সরকার বিনিয়োগের পথ ছেড়ে দেওয়ার পরেও ঘাটতি কেন? আসল কারণ প্রতি বছর বাজেটে কর ছাড় এবং প্রাপ্য কর অনাদায়ী ফেলে রাখা।

কত কর বকেয়া, বাজেটে তার উল্লেখ নেই। সংবাদে প্রকাশ ২০০১ সালে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কর বকেয়া ৬৪,৭৮৪ কোটি টাকা (সূত্র ঃ টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ২০.৩.০২) অর্থাৎ এ বছরের মোট ভরতুকির চেয়ে প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা বেশি। ভরতুকি বিরোধী বিশেষজ্ঞ ও কলমচিরা বকেয়া কর সম্পর্কে নীরব কেন?

আয়করে ছাড় ভোগ্যপণ্যের বাজার বাড়াতে

কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার উচ্চ আয়ের মানুষের আয়করে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে — অন্যদিকে পরোক্ষ কর যা মূলত জনসাধারণের পকেট থেকে যায়, তার থেকে সরকার আয় বাড়িয়েছে।

১০০ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষে আয়কর দেয় মাত্র ২ কোটি ৮৩ লক্ষ মানুষ, জনসংখ্যার তিন শতাংশেরও কম। অন্যদিকে দেশে সরকারি হিসাবেই ৩৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, যাদের দু-বেলা ভাত জোটে না। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক কোটি মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাইরে কিছু উপকরণ কিনতে পারে। অথচ দেশে উৎপাদন এখন অঢেল। রঙিন টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, মোটরগাড়ি দোকানে ধূলো খাচ্ছে। শিল্পপতিরা বাইরে বলছে আন্দোলন করে উৎপাদন ব্যাহত করা চলবে না; বলার পরে নিজেরাই উৎপাদন কমাচ্ছে, লে-অফ, ক্লোজার করছে। শিল্পপতিমহল বেশ কিছুদিন ধরেই বলছে অর্থনৈতিক মন্দার পিছনে রয়েছে বাজারে চাহিদার অভাব। তাদের একটা দাবিই ছিল চাহিদা বাড়াবার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আয়করে সরকার যে ছাড়টা দিয়েছে তার লক্ষ্য হল বাজারে টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন-এর মত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে শিল্পপতিদের সমস্যা মেটানো। যদি জনগণের মঙ্গল করা সরকারের লক্ষ্য হত, তাহলে তারা ৯০ কোটি ভারতবাসীর কথা ভাবত, দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে থাকা কোটি কোটি মানুষের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ (এর মধ্যেও জনগণের জন্য কত খরচ হবে তাতে সন্দেহ আছে) ঘোষণা করে দায়িত্ব শেষ করত না।

আসলে সবচেয়ে গরিব মানুষদের আয় সরকার বাড়াতে চায়নি। কারণ, তাদের আয় বাড়লে তারা ভাতের ওপর ডাল কিনবে, বড় জোর সাইকেল। টিভি, ফ্রিজ তারা কিনবে না। কিন্তু উচ্চবিত্তের হাতে পয়সা হলে শিল্পপতিরা যে মাল বেচতে চায় তার বিক্রি বাড়বে। তাই আয়করে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তার লক্ষ্য জনগণের নয়, শিল্পপতিদের সমস্যার সুরাহা করা।

বাগদাদ সম্মেলন

একের পাতার পর

কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন —

"ইরাকের বীর জনগণ, আপনারা যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মোকাবিলা করছেন, ভারতের শোষিত জনগণের পক্ষ থেকে সেজন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। চূড়ান্ত সংকটে জর্জরিত সাম্রাজ্যবাদ তথা মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের এই সমরাভিযান দেখিয়ে দিয়েছে — সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের জন্ম দেয়। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে যুদ্ধের বিপদও ততদিন থাকবে।"

তিনি বলেন — "ভারত সরকার যে মৌখিকভাবে ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলছে তার পেছনেও রয়েছে তাদের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। ইরাকের তেল, মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে প্রভাব বিস্তার তাদের লক্ষ্য। ভারত সরকারও এখন অস্ত্র ব্যবসায়ে নামছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ছোট শরিক হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামগ্রিক বোঝাপড়ার আওতায় ছোটখাট বিরোধের মধ্য দিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় একচেটে পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ভারত সরকারের লক্ষ্য। সেই সঙ্গে ইরাকের প্রতি মৌখিক সমর্থন জানিয়ে সংখ্যালঘু ভোট কবজা করাও শাসকদলের উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, যুদ্ধ বন্ধ করতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে বাধ্য করার জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা ধারাবাহিক-ভাবে আন্দোলনও চালাচ্ছি। তিনি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চ গঠন করা অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই বিভিন্ন দেশের আন্দোলনকে আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলিকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

কর্পোরেট ট্যাক্স আদায় হয়না

বাজেটের আগে একটা সোরগোল তোলা হয় যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে কর্পোরেট সংস্থা বা বৃহৎ কোম্পানিগুলির ট্যাক্স অনেক বেশি। এই ট্যাক্স কমানোর জন্য শিল্প সংস্থাগুলো বার বার আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে সরকারের কাছে।

বাস্তবে কি ভারতের কর্পোরেট সংস্থাগুলো অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি ট্যাক্স দেয়? না, তা দেয়না। বিধিবদ্ধ কর্পোরেট ট্যাক্স বর্তমানে ৩৬.৭৫ শতাংশ হলেও এই পরিমাণ ট্যাক্স কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে দিতে হয় না। কারণ আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারা উপধারায় ট্যাক্স ছাড়ের যে সব ব্যবস্থা আছে তার সুযোগ নিয়ে সংস্থাগুলো বড় অঙ্কের ট্যাক্স ছাড় পায়। ইকনমিক টাইমসের (১৭/২/০৩) একটি সার্ভে রিপোর্ট দেখিয়েছে ২০০ বৃহৎ কোম্পানী ২০০১-০২ সালে তাদের আয়ের উপর বাস্তবে ট্যাক্স দিয়েছে ২৯.৫ শতাংশ, যদিও এই সংস্থাগুলির বিধিবদ্ধ ট্যাক্স ছিল ৩৬.৭৫ শতাংশ। আই-টি-সি ও হিন্দুস্থান লিভার দুটি সর্বোচ্চ ট্যাক্সদাতা বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থা ২০০১-০২ সালে বিধিবদ্ধ ট্যাক্স ৩৬.৭৫% থেকে অনেক কম দিয়েছে। আই-টি-সি দিয়েছে ৩৩.৬ শতাংশ এবং হিন্দুস্থান লিভার দিয়েছে ১৯.৬ শতাংশেরও কম। ফলে, খাতাকলমে এদের ট্যাক্সের পরিমাণ ৩৬.৭৫% হলেও, এরা বাস্তবে ট্যাক্স দেয় অনেক কম। আই-টি-সি ও হিন্দুস্থান লিভার কোন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। এদের মত বৃহৎ কোম্পানিগুলির তিন-চতুর্থাংশ কোম্পানিই বিধিবদ্ধ ট্যাক্স রেটের চেয়ে অনেক কম রেটে ট্যাক্স দিয়েছে।

কর্পোরেট ট্যাক্স এদেশে সর্বাধিক —এই প্রচারটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তুলে কর্পোরেট সংস্থাগুলি তাদের ট্যাক্স আরো কমিয়ে আনতে চায়। কেলকার কমিটির রিপোর্টও কর্পোরেট সংস্থাগুলির পক্ষেই ওকালতি করেছে। কেলকার কমিটি বলেছে, বিধিবদ্ধ কর্পোরেট ট্যাক্স ৩৬.৭৫% থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করা হোক দেশীয় কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে এবং ৩৫% করা হোক বিদেশী কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে।

যখন সরকার টাকা নেই বলে হাসপাতাল, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর উপর চার্জ বাড়াচ্ছে, সাধারণ মানুষের উপর নানা ধরনের ট্যাক্সের বোঝা বাড়াচ্ছে, তখন কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে নানাভাবে কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হচ্ছে। তবুও মালিকরা সর্বদাই, তাদের মুনাফার উপর ট্যাক্স কমানোর দাবি তোলে এবং মালিকদরদী সরকার এদের দাবির কাছে সদাই নতশির।

মার্কিন রণহুংকার অস্ত্রব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থে

(আমেরিকার ওয়ার্কার্স পার্টির পত্রিকা থেকে)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পরিকল্পনা করেছেন পাঁচ বছর ধরে অন্ততপক্ষে ২৫ হাজার কোটি ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করবেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের দেশ 'সমরবাদ' বা 'মিলিটারিজম' নামক এক ভয়ঙ্কর রোগের খপ্পরে পড়েছে। আমেরিকার মুমূর্ষু একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সঙ্কটের গর্ভে জন্ম নিয়ে এই রোগটি আমাদের কোষাগার শূন্য করে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আজ গিলে খাচ্ছে। বিশ্বে শুধুমাত্র নিজেদের সাম্রাজ্য প্রসারের জন্যই যে পুঁজিপতিরা সমরবাদের প্রয়োগ করে তা নয়, আসলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে বেশি বেশি সরকারি হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে নিজেদের মুনাফা আরো বাড়িয়ে তোলার কৌশল হিসাবে সমরবাদকে ব্যবহার করে তারা। আজকের এই চূড়ান্ত মন্দার দিনে জর্জ বুশ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সমরবাদের আশ্রয় নিয়ে তাদের ডুবন্ত নৌকাকে ভাসিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে উন্মাদের মত জনসাধারণের সম্পদ লুঠ করছে।

উৎপাদিকা শক্তির সামাজিক চরিত্র এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত মালিকানা — এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বই হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক দ্বন্দ্ব। একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। পুঁজিপতিদের মুনাফা অর্জনের সঙ্কীর্ণ লক্ষ্য আজকের দিনের বিপুল সামাজিক উৎপাদনী শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে না। অতিরিক্ত উৎপাদনের সঙ্কট সৃষ্টি হয় এবং ক্রমেই তা বেড়ে চলে। এই পরিস্থিতিতে ইতিহাসের গতিপথে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ককে জবরদস্তি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে পুঁজিপতিরা 'সমরবাদ'-এর আশ্রয় নেয়। যুদ্ধ বাধিয়ে বা যুদ্ধের হাওয়া সৃষ্টি করে অর্থনীতির সামরিকীকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করতে সরকারকে বাধ্য করে তারা। এই পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে হলেও পুঁজিপতিরা বাড়তি উৎপাদনের সঙ্কট এড়িয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মার্কিন পুঁজিপতিরা এদেশের অর্থনীতিকে যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িয়ে রেখে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা গ্যারান্টি করেছে। যত দিন যাচ্ছে, অর্থনীতির সঙ্কট তত তীব্র হচ্ছে এবং পুঁজিপতিরা ক্রমেই আরো বেশি করে সামরিকীকরণের দিকে ঝুঁকছে।

সামরিকীকরণ পুঁজিপতিদের জন্য বিপুল মুনাফা সুনিশ্চিত করলেও সমগ্র অর্থনীতিকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। অর্থনীতির সামরিকীকরণ মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার বদলে শ্রমশক্তি সহ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলিকে বোমা তৈরিতে নিয়োজিত করে। এইভাবে দেশের সম্পদগুলিকে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে কাজে না লাগিয়ে তারা ধ্বংসের কাজে লাগায়। স্কুল, ঘরবাড়ি তৈরি বা জীবনের অন্যান্য জরুরি প্রয়োজন মেটাবার জন্য, বাঁচার জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি উৎপাদনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ না করে তারা বোমা বানায়। বোমা ক্ষুধার্ত মানুষের পেট ভরাতে পারে না, বোমা শুধু পারে মানুষ মারতে। এক কথায় বলা যায়, দেশের অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রাধান্যের কারণে সম্পদের যে অপব্যবহার ঘটছে, তার ফলে দেশের উৎপাদনী শক্তি ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অর্থ লুঠ করেই অর্থনীতির সামরিকীকরণের যাত্রা শুরু। রাজকোষের সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ ইতিমধ্যেই জর্জ বুশের মিলিটারি-বাহিনীর পিছনে ঢালা হয়ে গেছে। এখন আবার তার ওপরে মার্কিন সরকার সামাজিক নিরাপত্তার খাতের বরাদ্দ অর্থ যুদ্ধ পরিকল্পনার অন্যান্য খাতে ব্যয় করছে। এই ঘটনা নতুন নয়। ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় ঠিক এইভাবেই অর্থনীতির ব্যাপক সামরিকীকরণ ঘটানো হয়েছিল — যা থেকে জন্ম নেয় 'মন্দাস্ফীতি' — বা stagflation-এর মতো আর্থিক বিপর্যয়। ১৯৮০ ও ৯০ এর দশকে যে অভূতপূর্ব রাজকোষ ঘাটতির ঘটনা ঘটেছিল, তার পিছনে ছিল বিশাল সামরিক বাহিনীর জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রেগনের বিপুল অর্থব্যয়।

এর ফল ভুগছেন সাধারণ মানুষ — বেঁচে থাকবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদেরই টাকায় গড়ে তোলা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমরবাদের নৃশংসতা একদিকে কর্মহীন দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন না, স্কুলগুলো ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে, অন্যদিকে রাজকোষে জমা পড়া সাধারণ মানুষের টাকা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আরো মুনাফা লুটবার জন্য।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের উচিত অর্থনীতির সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে জোরদার আওয়াজ তোলা। দাবি তোলা দরকার — পেন্টাগণের অস্ত্র বিক্রেতাদের মুনাফা সুনিশ্চিত করতে নয়, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতেই জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করতে হবে। সামরিকীকরণের এই মারণব্যাধি আমাদের দেশ ও অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। এ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হল পচে-যাওয়া শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে নতুন অর্থনীতির সূচনা ঘটানো, যাতে শুধুমাত্র গুটিকয়েক মানুষের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মতলব হাসিল না হয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে। (১৭ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে ইন্টারনেটে পাঠানো প্রবন্ধ, www workersparty.org দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধের প্রতিবাদে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী

'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে যথার্থই বিস্ময়কর এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাময় ঘটনা ঘটছে খোদ আমেরিকার বুকে। 'দি ভিলেজ ভয়েস' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার রিপোর্ট অনুযায়ী 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০টি শ্রমিক সংগঠন — যারা ৪৫ লক্ষ শ্রমিকের (মোট ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকের প্রায় ৩০ শতাংশ) প্রতিনিধিত্ব করে — তাদের স্বাক্ষরিত এক প্রস্তাবে বুশ প্রশাসনের যুদ্ধ প্রস্তুতির তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে "আল-কায়েদার সঙ্গে, অথবা ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে ইরাকের যোগসূত্রের কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ নেই। আমেরিকার নাগরিকদের কাছে ইরাক প্রকৃতই বিপদ — এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ বুশ প্রশাসন দেখাতে পারেনি, রাষ্ট্রসংঘের অনুসন্ধানও পারেনি।" প্রস্তাবে বলা হয়েছে "যুদ্ধের প্রধান বলি হবে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত শ্রমিক পরিবারগুলির সন্তান-সন্ততিরা এবং নির্দোষ ইরাকি জনগণ।" প্রস্তাব বলেছে, "যুদ্ধের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে স্কুল, হাসপাতাল, আবাসন এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অর্থবরাদ্দ ছাঁটাই করেই।" প্রস্তাবে বলা হয়েছে "যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে, এবং তাকে অজুহাত করে ইতিমধ্যেই শ্রমিক, সাধারণ নাগরিক ও অধিবাসীদের অধিকারের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে, মানবাধিকার আক্রান্ত হচ্ছে।"

গত জানুয়ারি মাসে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত এক শ্রমিক সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন, যোগাযোগ, ডাক ও তার, রাজ্য সরকারি এবং মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী সহ লস অ্যাঞ্জেলস, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, ক্লিভল্যাণ্ড, স্যাকরামেণ্টো, আলবানি এবং উত্তর-পশ্চিম ইণ্ডিয়ানার সেণ্ট্রাল লেবার কাউন্সিল-এর জাতীয় স্তরের নেতারা, এক কথায় গোটা আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী। আমেরিকার বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন সংক্ষেপে এস আই ই ইউ নিজেই একক উদ্যোগে হোয়াইট হাউসে চিঠি পাঠিয়ে যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করেছে। নিউইয়র্কে এক ডজনেরও বেশি শ্রমিক সংগঠন যুদ্ধের বিরোধিতা করে প্রস্তাব নিয়েছে। নিউইয়র্ক রাজ্যের সব চাইতে বড় শ্রমিক সংগঠনটি তাদের অফিস ঘরটি যুদ্ধ বিরোধী সংগঠকদের ছেড়ে দিয়েছে যুদ্ধ বিরোধী কাজকর্ম চালানোর জন্য। এই ঘটনার গুরুত্ব সবদিক দিয়েই অসাধারণ। এটা বুঝিয়ে দেয় যে, যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যেও এখন তুঙ্গে, যেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গত ৮৫ বছরে দেখা যায়নি। (সংবাদ সূত্র ঃ ফ্রন্ট লাইন, ১৪ মার্চ, ২০০৩)

বহরমপুরে আমরণ অনশনরত অনাথ আবাসিকদের পাশে এস ইউ সি আই

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের সরকারি দুঃস্থ আবাস থেকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮ বৎসরে ঊর্ধ্বে বয়স এমন আবাসিকদের হঠাৎ পুলিশ দিয়ে জোর করে বার করে দেওয়া হয়। তারা আরও কিছুদিন সময় চেয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে ১২ জন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং কলেজে পাঠরত। মাতৃপিতৃহীন আশ্রয়হীন এই কিশোর-যুবকরা শিশু অবস্থা থেকেই এখানে লালিত হয়েছে। এদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের বিষয়কে উপেক্ষা করে এইভাবে বহিষ্কার করা চূড়ান্ত অমানবিক। উপায়ান্তরহীন ১৯ জন আবাসিক হোমের গেটের সামনেই আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। এদের সমর্থনে ঐ হোমের অন্যান্য প্রায় ৬০ জন শিশু-কিশোর আবাসিকও অনশন শুরু করে। সারা ভারত ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে বহিষ্কৃতদের পুনর্বাসন দাবি করা হয়। দ্বিতীয় দিন অনশন চলাকালীন পুলিশ ঐ আবাসিকদের জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। হোমের ভিতরে অনশনরত শিশু ও কিশোর আবাসিকদের অনশন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। হাসপাতালে তাদের খাওয়ানোর জন্য ডাক্তার ও নার্সদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঐ ১৯ জন অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। একমাত্র এস ইউ সি আই দল ও তার ছাত্র সংগঠন ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র কর্মীরা অনশনরতদের পাশে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলনে সহযোগিতা করে। অসুস্থ হয়ে পড়া স্নেহ-বঞ্চিত মাতৃ-পিতৃহীন অসহায় যুবকদের এই সাহসিকতা ও দৃঢ়তায় হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স সহ সকলেই হতবাক হয়ে যান। ছাত্র সংগঠন ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে শহরে পথসভা করে প্রশাসনের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ জানানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। বামফ্রন্ট সরকারের উপরমহল থেকেই বহিষ্কারের কঠোর নির্দেশ এসেছে। অনশনের চতুর্থ দিনেও অসুস্থ হয়ে পড়া অনশনরত যুবকদের অনমনীয় মনোভাব এবং এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে আন্দোলনের চাপে জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলা শাসক পরীক্ষার্থী ও পাঠরত ১২ জনকে সাময়িকভাবে হোমে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অপর ৭ জনের ব্যাপারেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে চতুর্থ দিন রাত্রে আমরণ অনশনের সমাপ্তি ঘটে।

ত্রিবান্দ্রমে অল ইণ্ডিয়া পাওয়ারমেনস ফেডারেশনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন

৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ত্রিবান্দ্রমে সর্বভারতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হল অল ইণ্ডিয়া পাওয়ারমেনস ফেডারেশন (এ আই পি এফ)। ৭ ফেব্রুয়ারি সম্মেলনের শুরুতে সহস্রাধিক বিদ্যুৎ শ্রমিক-কর্মচারী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ব্যানার ফেস্টুনে সুসজ্জিত এক বিশাল মিছিল বিদ্যুৎ ভবন অভিমুখে যায়। মিছিলকারীদের কণ্ঠে উদ্দীপ্ত শ্লোগান ছিল — 'বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারীকরণ করা চলবে না', 'বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন বাতিল কর', 'বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে ব্যবসা ক্ষেত্র করা চলবে না', 'বিদ্যুৎ বিল ২০০১ বাতিল কর'। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেডস কে পি কোশলা রামদাস, পশ্চিমবঙ্গের সমর সিন্‌হা, তামিলনাড়ুর পি নারায়ণ স্বামী, ওড়িশার কান্তি বিশ্বাস ও রাজেশ পানি, ঝাড়খণ্ডের মৃণাল সরকার, কর্ণাটকের সোমশেখর, বিহারের এ কে আনসারি, কেরালার ডি সুদর্শন, দিল্লির আর কে শর্মা, হরিয়ানার মেহার সিং, পাঞ্জাবের থানা সিং প্রমুখ। গান্ধী ময়দানে মিছিল পৌঁছালে সেখানে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কমরেড কে পি কোশলা রামদাসের সভাপতিত্বে। সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা থাকলেও অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণআইয়ার। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে রেকর্ড করা একটি বার্তায় তিনি বলেন — ১৯৫৭ সালে কেরালার মন্ত্রীসভায় তিনি প্রথম বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন, তখন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থায় তিনি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, কি কেন্দ্র কি বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি বিদ্যুৎক্ষেত্রের মত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারীকরণ করছে। একচেটিয়া শিল্পপতিদের হাতে এই ক্ষেত্রগুলিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা লুণ্ঠন। সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই। বেসরকারীকরণ হলে বিদ্যুৎগ্রাহক ও সাধারণ মানুষ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি শ্রমিকদের কাছে আবেদন করেন, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণ প্রতিহত করতে সর্বস্তরের জনগণকে সংগঠিত করে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হতে। কে পি কোশলা রামদাসের নেতৃত্বে যেসব শ্রমিক কর্মচারীরা সারা ভারত পাওয়ারমেনস ফেডারেশনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন তাদের তিনি অভিনন্দন জানান।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে একটি লিখিত বার্তা পাঠান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কমরেড সনৎ দত্ত ও বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দ। ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধি সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড কে পি কোশল রামদাসকে সভাপতি ও কমরেড সমর সিন্‌হাকে সাধারণ সম্পাদক করে সারা ভারত পাওয়ারমেনস ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নির্বাচন করা হয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কেরালা রাজ্য সভাপতি এবং সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড এ জালালুদ্দিন, পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার মেনস ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড শঙ্কর সাহা, কর্ণাটকের কমরেড ভেনুগোপাল ও অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি কমরেড রামদাস বলেন, অনেকে ভেবেছিলেন এটা কাগুজে সংগঠন দাঁড়াবে। কিন্তু তাদের হতাশ করে আমাদের সম্মেলন যথার্থই সফল হয়েছে। এই সংগঠনের জন্মের পিছনে রয়েছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কর্মচারীদের সংগ্রামের যথার্থ প্রয়োজনবোধ। কারণ শ্রমিক কর্মচারীদের উপর সরকার ও ম্যানেজমেন্ট মারাত্মক আক্রমণ, শোষণ ও হয়রানি চালাচ্ছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সংগঠন, যেমন এ আই টি ইউ সি, সিটু, এইচ এম এস, আই এন টি ইউ সি, এরা এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না, করতে পারেনা। কারণ, এরা দেশের শোষকশ্রেণীর ও প্রচলিত ব্যবস্থার অংশীদারে পরিণত হয়েছে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর উপর এই সন্ত্রাস ও আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনবোধ থেকেই আজকের এই সংগঠনের জন্ম হল। এই সংগঠনকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি সম্মেলনকে সফল করার জন্য কেরালার ও অন্য রাজ্যগুলি থেকে আগত কমরেডদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩*
২। *প্রকাশের কাল ঃ পাক্ষিক*
৩। *মুদ্রকের নাম ঃ আশুতোষ ব্যানার্জী জাতি ঃ ভারতীয় ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী কলিকাতা-৭০০০১৩*
৪। *প্রকাশকের নাম ঃ আশুতোষ ব্যানার্জী জাতি ঃ ভারতীয় ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী কলিকাতা-৭০০০১৩*
৫। *সম্পাদকের নাম ঃ আশুতোষ ব্যানার্জী জাতি ঃ ভারতীয় ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী কলিকাতা-৭০০০১৩*
৬। *সত্বাধিকারী ঃ সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ৪৮ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩*

আমি, আশুতোষ ব্যানার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

১০-৩-২০০৩ আশুতোষ ব্যানার্জী প্রকাশকের স্বাক্ষর

পূর্বমেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে ৭১ হাজার গণস্বাক্ষর সহ দাবিপত্র পেশ

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি, শিক্ষার ফি বৃদ্ধি, জমির খাজনা ও সেস বৃদ্ধির প্রতিবাদে, উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুনর্বাসন, তমলুক-দীঘা রেললাইন দ্রুত সম্পূর্ণ করা, চন্দ্রকোনা-ঘাটাল-পাঁশকুড়া রেললাইন নির্মাণ, নতুন হিমঘর এবং কংসাবতী ব্রীজ নির্মাণ সহ ১৪ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে তমলুক মহকুমায় ৭১,৩৯৪টি গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২৪ ফেব্রুয়ারি তিন শতাধিক মানুষ মিছিল করে তমলুকে পূর্বমেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তরে জমা দেন। জেলা শাসক অফিস প্রাঙ্গণে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস সন্তোষ মাইতি, মন্মথ দাস, সূর্য জানা ও নকুল জানা।

দিল্লীতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিক্ষোভ ও কনভেনশন

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উপর আক্রমণ প্রতিরোধে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক মহতী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল গত ২৭ জানুয়ারি দিল্লীর কনস্টিটিউশন ক্লাবে। সারা ভারত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সভাপতি কমরেড এম সি ত্যাগী কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন, উদ্বোধন করেন সহ-সভাপতি কমরেড অমর রায়। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। প্রস্তাবে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের চাকরির বয়স সীমা কমানো, স্বেচ্ছাবসরের নামে ছাঁটাই, অর্জিত অধিকার হরণ, আরও যন্ত্রীকরণ এবং আই ডি বি আইকে 'করপোরেটাইজ' (একচেটিয়া মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া) করার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। প্রস্তাবে ইরাকের উপর আমেরিকার আক্রমণের বিরোধিতা করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, হরিয়ানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু-র প্রতিনিধিবৃন্দ এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশনের আগে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা পার্লামেন্টের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। সারা ভারত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে কমরেড এম সি ত্যাগী, কমরেড অমর রায়, কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল, কমরেড পূর্ণ বেহেরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভারতের অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মুর্শিদাবাদে বি এস এফের গুলিতে ছাত্রের মৃত্যু

ডি এস ও'র ডাকে ছাত্র ধর্মঘট

সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্দোষ সাধারণ মানুষের উপর বি এস এফ-এর নারকীয় অত্যাচার, লুঠতরাজ, গুলি চালিয়ে নিরীহদের খুন করার ঘটনা যে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার ১৮ জানুয়ারির ঘটনা তারই জ্বলন্ত নিদর্শন।

ঐ দিন নিমতিতা হাইস্কুলে যাওয়ার পথে একজন ছাত্রের সাইকেলে বি এস এফ-এর এক কর্মীর গায়ে ধাক্কা লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বি এস এফ কর্মী ছাত্রটিকে প্রচণ্ড মারধর করে। ছাত্র-শিক্ষকরা মারধর করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ঐ বি এস এফ কর্মী উত্তর না দিয়েই গুলি চালায়। এতে ৩ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। ২ জন ছাত্রকে জঙ্গীপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় নবমশ্রেণীর ছাত্র সিদ্ধার্থ সিংহকে কলকাতায় এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র ডাকে জেলা জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি সিদ্ধার্থ সিংহ মারা যায়। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ডি এস ও'র রাজ্য কমিটির আহবানে রাজ্যজুড়ে শোক দিবস পালিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী ও সমসেরগঞ্জ থানায় স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

বি এস এফ-এর অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্রদের সাইকেল মিছিল বহরমপুর শহর পরিক্রমা করে। অন্যদিকে এস ইউ সি আই সুতী লোকাল কমিটির ডাকে ছাত্র ও সাধারণ মানুষের এক শোক মিছিল শহর পরিক্রমা করে এবং বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয়।

মালদা কালেকটরেটে অবস্থান

বিদ্যুৎ-হাসপাতাল-শিক্ষা-কোর্ট ফি বৃদ্ধি এবং জলকর চালুর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই দলের ডাকে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলা কালেক্টরেট বিল্ডিং-এর সামনে গণঅবস্থান হয়। শতাধিক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে অবস্থানে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল নন্দী।

অবস্থান থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলা জজের কাছে কোর্ট ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্মারকলিপি দিলে তিনি তা ঊর্ধবতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবার আশ্বাস দেন।

নন্দীগ্রামে গণআইন অমান্য

এলাকায় জলসেচ ও নিকাশীর ব্যবস্থা, বি পি এল তালিকা সংশোধনের দাবি সহ বিদ্যুৎ-শিক্ষা-হাসপাতালে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৭ ফেব্রুয়ারি পূর্বমেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ১নং বিডিও অফিসে এস ইউ সি আই-এর ডাকে গণ আইন অমান্য করে ২৩৪ জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই আইন অমান্যে নেতৃত্ব দেন দলের জেলাকমিটির সদস্য কমরেডস্ ভবানীপ্রসাদ দাস ও নন্দ পাত্র।

কুলতলির সড়ক ও সেতু জনগণের দীর্ঘ আন্দোলনেরই ফল

উদ্বোধনী সভায় কমরেড প্রবোধ পুরকাইত

(দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি ব্লকে দুটি সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কৈখালিতে একটি সভা করেন। সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সরকার ও শাসকদলের পক্ষ থেকে নানা প্রচার তোলা হয়, উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারও চালানো হয়। সর্বোপরি 'সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যেন এক বিরাট কর্মযজ্ঞ করছে, এমন একটা আবহাওয়া তৈরির চেষ্টা হয়। ঐ উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন কুলতলি কেন্দ্রের বিধায়ক, এস ইউ সি আই নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। সড়ক ও সেতু নির্মাণ ও সুন্দরবনের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটটি সামনে রেখে তিনি সভায় যা বলেছেন, এখানে তা প্রকাশ করা হল।)

কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলেন, আজ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কুলতলির নেমানিয়া নদী ও পেটকুলচাঁদ নদীর উপর নবনির্মিত দুটি সেতুর উদ্বোধন করেছেন। এ জন্য কুলতলির সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই দুটি সেতু হওয়ায় কুলতলি, কৈখালি এবং কুলতলির শেষপ্রান্ত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা কিশোরীমোহনপুরকে যুক্ত করা গেল। পিছিয়ে-পড়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এই এলাকায় এই কাজ বহুদিন পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। দুটি সেতু জনগণের দীর্ঘ লড়াই, আন্দোলনের ফল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই দুটি সংযোগকারী সড়ক ও সেতু নির্মাণের পিছনের ইতিহাসকে বিকৃত করে প্রচার চালানো হচ্ছে এবং কুলতলির 'বিরাট উন্নয়ন' করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। সড়ক ও সেতু নির্মাণের পেছনে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ও সংগ্রামের ইতিহাস কুলতলির মানুষমাত্রই জানেন। তবুও আমি আজ কিছু ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই ১৯৮৩ সালে সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের নদীবাঁধ ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবেছিল। তলিয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার বিঘা জমির ধান। ঘর বাড়ি মাটিতে মিশে গিয়েছিল। ছাগল, গরু, ভেড়া মরেছিল। হাজার হাজার মানুষ হয়েছিল সর্বস্বান্ত। বিশাল ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে বহুদিন সময় লেগেছিল। এলাকার রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণের জন্য সেদিন কেন্দ্রের জনতা সরকার অর্থবরাদ্দ করেছিল। সেই অর্থ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ফ্লাড রিলিফ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকগুলিতে দেওয়া হয়েছিল। কুলতলি ব্লকের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেই সময় এস ইউ সি আই দল পরিচালিত কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন জিতেন পাল মহাশয়। আমরা সেদিন কুলতলি ব্লকের উত্তরসীমা ক্যানিং থানার হেড়োভাঙা থেকে দক্ষিণে মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশোরীমোহনপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৮ কিমি রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিলাম।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে কুলতলি ব্লকের ৯টি গ্রাম-পঞ্চায়েতের অবস্থান একটির তলায় একটি। এই ৯টি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে কোনও সংযোগকারী রাস্তা ছিল না এবং কয়েকটি নদী থাকায় এরা ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই ৯টি গ্রামপঞ্চায়েতকে যুক্ত করার জন্য সেদিন ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে মাটির রাস্তাটি করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়িত করার জন্য তৎকালীন জেলা শাসক রাণু ঘোষ মহাশয়া আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছিলেন। মাটির রাস্তাটি পরবর্তীকালে পাকা সড়কে যাতে রূপান্তরিত করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাস্তা চওড়া করা হয়েছিল। এই রাস্তাটি করার জন্য সাড়ে তিন হাজার বিঘা জমি সরকারি অধিগ্রহণ ছাড়াই রাস্তার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং জনগণের সহযোগিতায় তিন-চার মাসের মধ্যে রাস্তাটি নির্মাণও সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। কিছু কিছু জায়গায় বাধা পেলেও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় তা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। সে সময় একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এই রাস্তাটির কাজ দেখে প্রশংসা করেছিলেন। তারপর সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্যরূপে আমি এলাকার জনগণকে নিয়ে দাবি তোলায় সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ থেকে ৮ ফুট চওড়া ডবল সোলিং ইটের রাস্তা করা হয়েছিল, একথা কারোর অজানা নয়। তারপর থেকে জনগণের মধ্যে দাবি ওঠে — পেটকুলচাঁদ, নেমানিয়া, হুকাহারানিয়া, পিয়ালী নদীর উপর সেতু ও পাকা সড়ক চাই।

এই দাবি নিয়ে স্তরে স্তরে দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন চলতে থাকে। চলে গণস্বাক্ষর, ডেপুটেশন, অবস্থান, বিক্ষোভ, ঘেরাও আন্দোলন। দীর্ঘ সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৭-৮ বছর পূর্বে তৎকালীন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী জামতলা থেকে পেটকুলচাঁদ পর্যন্ত পাকা সড়ক ও পেটকুলচাঁদ সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। জনসাধারণের উপস্থিতিতে আমি দাবি করেছিলাম — পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য মন্ত্রীরা শিলান্যাস করেছেন, কিন্তু বহু জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে শিলান্যাসের পর সেতু ও সড়ক যেন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিন বছরের মধ্যে সড়ক ও সেতু নির্মাণ করা হবে। তিন বছরের মধ্যে না হলেও ৭-৮ বছরের মধ্যে তা সম্পন্ন করা হলো। কিন্তু ১৯৮৫ সালে মাটির রাস্তাটির কাঠামো তৈরি করা নাহলে আজ সড়ক ও সেতুর কথা ভাবাই যেত না। রাস্তা ও সেতু নির্মাণের এই প্রকৃত ইতিহাসকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে ও চাপা দিয়ে অন্য জিনিস প্রচার করা হচ্ছে। আমি আরও বলতে চাই যে, সেতুর দু'দিকে অ্যাপ্রোচ রোড এখনও পাকা করা হয়নি। কেবল ঝামা-খোয়া দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এই কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হল। আমি মনে করি, সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড সম্পূর্ণ পাকা করে উদ্বোধন করা হলে ভাল হত। যাই হোক, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি স্বাগত জানাই।

সুন্দরবনের উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রবোধ পুরকাইত বলেন, আজ কুলতলির কৈখালিতে বনবিবি উৎসব শুরু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছেন। শ্লোগান উঠছে — 'সুন্দরবনকে ভালোবাসো, রক্ষা কর, যত্ন কর'। নদীবাঁধ, বন ও পরিবেশ, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে কয়েকদিন ধরে চলবে সেমিনার। সরকারি অর্থব্যয়ে ৪ দিন ধরে উৎসব চলবে। এই করে কি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' হিসাবে ঘোষিত পিছিয়ে-পড়া সুন্দরবন এলাকার সামগ্রিক সমস্যার সমাধান হবে? নদীবাঁধ, কৃষি, সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং সর্বোপরি এখানকার জনসাধারণের জীবনজীবিকার সমস্যাগুলির সমাধান এর দ্বারা হবে কি? সুন্দরবনের যথার্থ উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম এই এলাকার নদীবাঁধ সুদৃঢ় ও সুউচ্চ করে জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার হাত থেকে জমি ও মানুষের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। চাই উপযুক্ত জলনিকাশী ব্যবস্থা। নদীভাঙন বন্ধ করতে হবে। এক ফসলি জমিকে দোফসলি করার জন্য খালবিল খনন ও জলাধার করা, সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এ পর্যন্ত তা করা হয়নি। চাষির ফসল ও শাকসব্জীর দাম নেই। অথচ সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধের দাম লাগামছাড়া। এ বছর টোম্যাটোর দাম নেই। বাজারে টোম্যাটো স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। বড় বড় এক ঝুড়ির দাম মাত্র ৫ টাকা। চাষির মাথায় হাত। অভাবী চাষির ধান কুইন্টাল পিছু ৫৩০ টাকায় কেনার কথা সরকার ঘোষণা করেছে, কিন্তু কেনার কোন ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি কোন্ এলাকায় সরকার ধান কিনবে, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে কুলতলি, জয়নগর, গোসাবা, বাসন্তী থানার নাম নেই। যদিও ঘোষিত এলাকাগুলিতেও কেনার কোন ব্যবস্থাই নেই।

সুন্দরবনের মানুষের শিক্ষার সর্বস্তরের বিদ্যালয় ও কলেজ, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য নূতন নূতন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যোগাযোগের জন্য রাস্তা ও সড়ক, পানীয় জলের জন্য নলকূপ, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, মৎস্য বন্দর ও চাষের পরিকল্পনা আজও নেওয়া হয়নি। সুন্দরবনের বনজসম্পদভিত্তিক ছোট শিল্প গড়ে বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন পরিকল্পনাও নেই। দুই একটি সড়ক ও সেতু করে 'উন্নয়ন উন্নয়ন' প্রচার করলেই যথার্থ উন্নয়ন হয় না। মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিই তো যথার্থ উন্নতি। কোথায় সেই উন্নতি? মানুষ অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

সর্বশেষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কুলতলির জনগণের পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবি জানাচ্ছি — পেটকুলচাঁদ সেতুর পর দক্ষিণে কিশোরীমোহনপুর ১১ কিমি ও জামতলা থেকে উত্তরে হেড়োভাঙা পর্যন্ত পাকা সড়ক এবং মাঝে পিয়ালী নদী, হুকাহারানিয়াতে সেতু নির্মাণ করলে জয়নগর-মজিলপুর রেলস্টেশন এবং ক্যানিং রেলস্টেশনের সাথে সরাসরি পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প ও টেলিযোগাযোগ প্রকল্পের কাজ অতি মন্থর গতিতে চলছে — একাজ দুটি ত্বরান্বিত যাতে হয় তার প্রতিও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও বিদ্যুতের মূল্য যেরকম অস্বাভাবিক বাড়ানো হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎ নিতে পারবে না। এই কাজগুলি যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় তার জন্য দাবি জানিয়ে কুলতলির সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কুলতলিতে বনরক্ষীদের ওপর পুলিশের গুলি

কুলতলি থানার সেকেণ্ড অফিসার মহাদেব হালদারের বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ — কাঠের চোরাকারবারীদের মদত দিতে তিনি গুলি চালিয়েছেন বনরক্ষীদের ওপর। অভিযোগ, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি চারজন বনরক্ষী মাতলা নদীর চড়ার জঙ্গলে গার্ড দিয়ে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন মহাদেব হালদার ভুটভুটিতে করে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঐ জঙ্গলের কাছে যান এবং বনরক্ষীদের নৌকার উপর চার রাউণ্ড গুলি চালান। বনরক্ষীরা প্রাণের ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন। বনরক্ষী ভূতনাথ পুরকাইতকে ধরে তিনি প্রচণ্ড মারধর করে আইডেনটিটি কার্ড কেড়ে নেন। তাকে চাকরি খাওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁর আত্মীয়দের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় লোকজন। এরপর ডাকাতির মিথ্যা কেস দিয়ে তাকে আলিপুর কোর্টে চালান দেন। মহাদেব হালদারের এই ধারাবাহিক অত্যাচার ও দুর্নীতির বহু ঘটনা ইতিপূর্বে বহুবার পুলিশ সুপার ও ডিজিকে জানিয়ে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় কুলতলির সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২৯ সংখ্যা ৮

বিদ্যুৎ বিল বয়কট প্রসঙ্গে রাজ্য কমিটির বিবৃতি

বিদ্যুতের বাড়তি বিল বয়কট কর্মসূচি সম্পর্কে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন—

"যেহেতু সি-ই-এস-সি ফেব্রুয়ারি মাসের বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল আপাতত গ্রাহকদের পাঠাচ্ছে না, সেইজন্য পূর্ব ঘোষিত ১ মার্চ থেকে বিল বয়কটের কর্মসূচি স্থগিত থাকছে। পরে বাড়তি বিল যখনই পাঠাবে, তখনই সেই অনুযায়ী বয়কটের দিন স্থির করে জানানো হবে।

লাগাতার বিল বয়কটের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বস্তরের গ্রাহকদের এলাকা ও পেশাভিত্তিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা ও সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

কোর্ট ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি

কোর্ট ফি বৃদ্ধি করে বিচারব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করার সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় আন্দোলনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ে দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। অবিলম্বে কোর্ট ফি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বক্তারা গত ২৭ জানুয়ারি ঐতিহাসিক বাংলা বন্‌ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে বিদ্যুৎ-শিক্ষা-হাসপাতালের বাড়তি চার্জ ও জলকর প্রত্যাহার এবং উত্তরবঙ্গের সমস্ত বন্ধ চা বাগান খোলার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

অবস্থানে বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন মল্লিক, গৌতম ভট্টাচার্য, তন্ময় দত্ত সহ অন্যান্য বক্তারা।

তমলুক

বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবিতে এস ইউ সি আই দলের আহবানে ২৪ ফেব্রুয়ারি তমলুক কোর্ট প্রাঙ্গণে বেলা ১২ থেকে ৫টা পর্যন্ত শতাধিক মানুষ গণঅবস্থান করেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন কমরেডস আশুতোষ সামন্ত, লেখা রায়, প্রদীপ দাস, অশোক ঘোষ প্রমুখ।

উত্তর ২৪ পরগণা

বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর কোর্টে সারাদিনব্যাপী অবস্থান করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমরেড দ্বিজদাস চ্যাটার্জী, রমেন রায়, সুমিত ভাদুড়ী, কল্পনা রায় এবং রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল। অবস্থান থেকে এ ডি জে এম-এর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি

কোর্ট ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ২৪ ফেব্রুয়ারি সারাদিনব্যাপী জলপাইগুড়ি কোর্টের সামনে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও অবস্থান আন্দোলনের কর্মসূচি পালিত হয়। এস ইউ সি আই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা জজের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক বলেন, ২৭ জানুয়ারি সর্বাত্মক সফল বাংলা বন্‌ধের অন্যতম দাবি ছিল বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহার। সরকারের উচিত জনমতের প্রতি মর্যাদা দিয়ে এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা।

বর্ধিত কোর্ট ফি-র প্রতীক পুড়িয়ে প্রতিবাদ পুরুলিয়ায়। অগ্নিসংযোগ করছেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ

কোর্ট ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে জলপাইগুড়িতে গণঅবস্থান

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবস্থান বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণার কামারহাটি রিজিওনাল অফিসে সারাদিন অবস্থান এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। অবস্থান চলাকালীন গ্রাহকরা প্রবল উৎসাহের সাথে সমিতির সদস্য হন এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লেখান। অবস্থানে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সহ-সভাপতি সদানন্দ বাগল, জেলা সম্পাদক অনুকূল ভদ্র, রাজ্য কমিটির সদস্য রমেন রায় এবং কামারহাটি বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পক্ষে শান্তিরাম দাস উপস্থিত ছিলেন।

ধানতলাকাণ্ডের প্রতিবাদ কাঁচরাপাড়ায়

নদীয়ার ধানতলায় বরযাত্রীদের বাস থামিয়ে সি পি এম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যেভাবে মহিলা যাত্রীদের উপর জঘন্য পাশবিক নির্যাতন করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাট করার উদ্দেশ্যে বাস-ড্রাইভারকে খুন করে — তার প্রতিবাদে ১০ ফেব্রুয়ারি বিকালে এস ইউ সি আই কাঁচরাপাড়া লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় গান্ধী মোড়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল, ডি এস ও'র জেলা সভাপতি কমরেড স্বপন দেবনাথ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যারাকপুর মহকুমার সভানেত্রী কমরেড কল্পনা রায় এবং শিক্ষক নেতা কমরেড কালিপদ দেবনাথ।

সভাশেষে মিছিল সহকারে ধানতলার নারকীয় কাণ্ডের প্রতিবাদে ডি জি'র উদ্দেশ্যে ৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি বীজপুর থানায় স্থানীয় অফিসার-ইনচার্জকে দেওয়া হয়।

কমরেড ধীরেন সরকারের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই দলের বিশিষ্ট সংগঠক, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য এবং শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড ধীরেন সরকার উচ্চ রক্তচাপে গুরুতর অসুস্থ হয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি যাদবপুর চিত্তরঞ্জন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় প্রিয়জন ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে, বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে যান শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

'৫০-এর দশকের শেষদিকে যাদবপুর এলাকায় এস ইউ সি আই-এর সাংগঠনিক কাজের সূচনাকালেই কমরেড ধীরেন সরকার দলের বিপ্লবী আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে দলের সাথে যুক্ত করেন। চাকুরিজীবনে তিনি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনে অগ্রণী সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। ঐসময় ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, যাদবপুরের কৃষ্ণা গ্লাসের শ্রমিকদের উপর মালিকী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কমরেড ধীরেন সরকারের নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল। কৃষ্ণা গ্লাস মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি আদায় করতে সমর্থ হয়। ক্ষিপ্ত মালিক ১৯৬৭ সালে পূজা বোনাসের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সি পি এম এবং কংগ্রেস আশ্রিত গুণ্ডা-সমাজবিরোধীদের দিয়ে কমরেড ধীরেন সরকারের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়, লোহার রডের আঘাতে হাত-পা ভেঙে দিয়ে, মাথা ফাটিয়ে মৃত মনে করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়। দীর্ঘ ৬ মাস হাসপাতালে চিকিৎসার দ্বারা তাঁর জীবনরক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই আক্রমণও তাঁকে দমাতে পারেনি। পারিবারিক জীবনেও বহু আঘাতে তিনি অবিচল থেকেছেন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য দল তাঁকে রাজ্যভিত্তিক কর্মচারী আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়। সরকারি কর্মচারী থেকে কলকারখানার শ্রমিক — সকলের মধ্যেই তিনি দলের বিপ্লবী রাজনীতি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রয়াসেই কৃষ্ণা গ্লাসের বহু শ্রমিক দলের কর্মী হয়ে এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসেন। পার্টির আহ্বান অনুযায়ী তিনিই প্রথম যাদবপুরে জনগণকে নিয়ে গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গণকমিটি গড়ে তোলেন। অধুনা কুমুদশঙ্কর রায় হাসপাতাল বাঁচাও আন্দোলনে, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি এলাকায় নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। শোষিত গরিব মানুষের প্রতি তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি অঞ্চলের মানুষের অত্যন্ত আপনজন ছিলেন। স্থানীয় মানুষের আবেদনে তাঁর শেষকৃত্য গড়িয়া শ্মশানেই করা হয়।

কমরেড ধীরেন সরকার লাল সেলাম।

ভ্রম সংশোধন

গত ১১ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য গণদাবীতে (৫৫/২৭) প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি তথ্যগত ভুল ঘটেছে। বিদ্যুৎ মাশুল সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ২০০২ সালের ১৪ মে কলকাতা হাইকোর্ট ২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়ায়, ঐ রায় চ্যালেঞ্জ করে অ্যাবেকা ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সুপ্রিম কোর্টে যায়। ঐ মামলায় সি-ই-এস-সি বিবাদী পক্ষ হিসাবে যোগ দিয়েছিল। তথ্য পরিবেশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। — সম্পাদক, গণদাবী।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net